

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর

সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও বাংলাদেশের নবজন্ম



১৯৭১



বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর :

সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও

বাংলাদেশের নবজন্ম



বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

প্রথম সংক্রণ || ৭ নভেম্বর ২০২০
(প্রকাশকাল || ৭ নভেম্বর ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি

মুখ্যবন্ধ

“ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর :
সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও বাংলাদেশের নবজন্ম”

শীর্ষক এ পুষ্টিকাটি পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের শাসনামলে ২০২০ সনের ৭ নভেম্বর (কভিড সময়কাল) প্রণীত হয়। কিন্তু সে সময়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত মানবতাবিরোধী গুরু, খুন, ক্রস-ফায়ার, reign of terror, আয়ন-ঘরের জাতীয় অমানবিক নির্যাতন এবং বিরাজমান ভয় ও জীবনাত্মকসহ নানাবিধি বৈরী পরিস্থিতিতে পুষ্টিকাটি আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

এ বছর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী শাসনের পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশে প্রথম ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লব দিবসকে কেন্দ্র করে ২০২০ সনে ফ্যাসিস্ট হাসিনা আমলের পটভূমিতে প্রণীত এ পুষ্টিকাটি ত্বরিত প্রকাশ করা হ'ল।

গবেষণালুক ও তথ্যসমূহ এ পুষ্টিকাটি বিদ্ধি পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে এ প্রত্যাশায়।

১৯৭৫ এর ৭ নভেম্বর নতুন এক বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। বাকশাল আর আওয়ামী দুঃশাসনের শেকল ভেঙে জন্মেছিল লক্ষ শহীদের কাঙ্ক্ষিত এক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। কিন্তু বিগত দেড় দশক ধরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে ফ্যাসিজমের রাজত্ব কায়েম করে। হত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নানামুখী সংগ্রামে বিগত বছরগুলোতে বিএনপিসহ গণতন্ত্রকামী হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ গুরু, খুন ও শহীদ হয়েছে, লক্ষাধিক মানুষ হামলা-মামলার শিকার হয়েছে, কারাবরণ করেছে। অবশেষে গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে দীর্ঘ পুঞ্জিভূত জনরোষ বিস্ফোরিত হলে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন হয়। অর্জিত হয় দ্বিতীয় স্বাধীনতা। প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তবে প্রধানতম প্রত্যাশা হলো হত ভোটাধিকার ফিরে পাওয়া। যে গণতন্ত্রের জন্য ছাত্র-জনতা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, একটি অবাধ সুষ্ঠু ইহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া।

❖

৭১ এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালয়ে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসী মহান স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমানের যে ঐতিহাসিক নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ করেছিল, ইতিহাসের ডাকে পুনরায় একইরূপে ৭৫-এর ৭ নভেম্বর জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন জিয়াউর রহমান। মনে হয় জাতির প্রতি এই মহান দুই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার জন্য ইতিহাস পূর্বনির্ধারিতভাবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকেই নির্বাচিত করে রেখেছিল।

❖

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একদলীয় বাকশাল নয়, বহুদলীয় কার্যকরী গণতন্ত্রই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা; সমাজতন্ত্রের নামে লুটপাটের অর্থনীতি নয়, জনগণের অংশছাত্রণে উৎপাদন ও উন্নয়নের সৃজনশীল প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম; সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিসভার (Majoritarian) সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ নয়, উদার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’ই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের পরিচয়ের মূল ভিত্তি; ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা নয়, সকল ধর্মের সমানাধিকারসহ ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সংস্কৃতিই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. আজকের প্রেক্ষাপটে ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য	০৭
২. মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক মহান স্বাধীনতার ঘোষণা	০৯
৩. ৭২-৭৫ পর্ব: আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ, বাকশাল এবং তার পরিণতি	১৫
৪. রাজনীতিতে ব্যক্তিগত সংস্কৃতি বনাম রাষ্ট্রনায়কের মূল্যবোধ	১৯
৫. ৩ নভেম্বর ও খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ কু	২০
৬. জাসদ ও তাহের প্রসঙ্গ	২০
৭. জেনারেল জিয়াউর রহমান সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের ও আওয়ামী লীগের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য	২৯
৮. ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর: সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও বাংলাদেশের নবজন্ম	৩২
৯. ইতিহাসের ডাকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাড়া ও বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার	৩৬
১০. জাসদ থদত্ত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা [পরিশিষ্ট- ১]	৩৮
১১. দিনপঞ্জি- ১৯৭৫ (জানুয়ারি- নভেম্বর) [পরিশিষ্ট- ২]	৩৯



৭ নভেম্বর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ গর্বিত
জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

আজকের প্রেক্ষাপটে ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এর পূর্বের বাংলাদেশ আর ৭ নভেম্বরের পরের বাংলাদেশ সম্পূর্ণ আলাদা। ৭ নভেম্বরের আগের বাংলাদেশ ছিল একদলীয় বাকশালী অন্ধকারে পতিত দিশাইন এক ভূখণ্ড; আর ৭ নভেম্বরের অব্যবহিত পরের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে দৃঢ় পায়ে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া এক নতুন স্বপ্নভূমি। ৭১-পরবর্তী দুঃশাসনের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগেরই একাংশের হাতে ১৫ আগস্ট সংঘটিত হয় সপরিবারে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সে সময় দেশে যে নিদারণ অরাজকতা বিরাজ করছিল তার নিরসন ঘটে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। মূলত ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার দিকে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। এই বিপ্লবের মাধ্যমেই বাংলাদেশের নবজন্ম ঘটে। ৭ নভেম্বর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ গর্বিত জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

৭ নভেম্বর-এর পর সংখ্যাগরিষ্ঠ (Majoritarian) জাতিসত্ত্বার সংকীর্ণ “বাঙালি জাতীয়তাবাদের” পরিবর্তে বাংলাদেশ উদার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’-এর পথে যাত্রা শুরু করে। সমাজতন্ত্রের নামে লুটপাটের অর্থনীতির পরিবর্তে ফিরে আসে উৎপাদননির্ভর উন্নয়ন অর্থনীতির পথে। শুরু হয় ঔপনিবেশিক বাঙালি সংস্কৃতির বদলে আত্মর্যাদাশীল স্বকীয় ‘বাংলাদেশী সংস্কৃতির বিকাশ ও স্বাধীন বাংলাদেশী জাতিসত্ত্ব’র নতুন যাত্রা। অবহেলিত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নেতৃত্বকৃত ফিরে আসে সমাজ জীবনে। ক্রমাগত সরে যেতে থাকে হতাশার কালো মেঘ। উদিত হয় নব আশার নতুন সূর্য। আর এই নতুন সূর্যেদয়ের নতুন নায়ক ইতিহাসের বরপুত্র শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান আবির্ভূত হন জাতির মুক্তির আলোকবর্তিকারুণ্যে। সেদিন দিশেহারা জাতিকে তিনি দিশা দেখিয়েছিলেন। একইভাবে ১৯৭৫-এর ৭ ই নভেম্বর জাতির এক চরম ক্রান্তিকালে তিনি পুনরায় জাতীয় কাঞ্চির বা ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ইতিহাস অর্পিত দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে আপন মহিমায় আত্মবিকশিত হওয়ার পথ সুগম করে দেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। জাতির মহা-সংকটে শহীদ জিয়া বার বার মুক্তির

আলোকবর্তিকা হিসেবে ইতিহাসের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই থেকেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতির অঙ্গনিহিত আস্থার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছেন।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। এক; এই দুটি ক্রান্তিকালেই সৈনিক এবং সাধারণ জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে বিপ্লবে নেমেছে। দুই; উভয় কালেই সাধারণ সৈনিক এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে। তিনি; উভয় সময়েই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ছিল অনন্য। ৭১ এর ২৫ মার্চের গণহত্যার প্রাক্কালে জনগণের নির্বাচিত নেতারা পলায়নের পথ বেছে নিলে নেতৃত্বশূন্য ও আক্রান্ত জনগণ অসহায় হয়ে পড়ে। সেই ঘোর দুঃসময়ে ইথারে ভেসে আসলো জিয়াউর রহমানের কর্তৃত্ব, ‘আমি মেজর জিয়া বলছি’। সেদিন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জিয়া কাঞ্চিরহীন জাতিকে আলো দেখিয়েছিলেন। একইভাবে ৭৫-এর ৭ নভেম্বর ভোরে বেতার তরঙ্গে আবার ভেসে আসলো সেই একই কর্তৃ: ‘আমি জিয়া বলছি’। পুনরায় জাতীয় দুর্যোগের কাঞ্চির হিসেবে আবির্ভূত হলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

স্বাধীনতার পরপরই মহান বিজয়ের সমষ্ট অর্জনকে স্থান করে দিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশে কায়েম হয়েছিল চরম নৈরাজ্য। যে গণতন্ত্র, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ শহীদ আত্মহতি দিয়েছিলেন সেই গণতন্ত্রকে হত্যা করে জারি করা হয় একদলীয় বাকশালী শাসন। আজকের বাংলাদেশ তার চেয়েও ভয়াবহ স্বৈরাচারী শাসনের কবলে পড়েছে। বর্তমানে দেশে গুম, হত্যা, নৈরাজ্য, লুটপাট, ও নজিরবিহীন বিচারহীনতার যে উৎসব শুরু হয়েছে তা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্রকেও হার মানায়। বর্তমানে বাংলাদেশে জনগণের সমষ্ট মৌলিক অধিকারকে হত্যা করে একটি নজিরবিহীন ভয়ের সংস্কৃতি কায়েম হয়েছে, দেশের সমষ্ট বাহিনী ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের মাধ্যমে গোটা দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রাণে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ একটি স্বৈরাচারিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বিভিন্ন কালো আইনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ব্যক্তি বা জনগণের মত প্রকাশসহ চিন্তার স্বাধীনতাকে গলা টিপে ধরা হয়েছে। এদেশে এখন গুম-খন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেই একই আওয়ামী-বাকশালী রাজনৈতিক চক্রের

হাতে দেশের গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও সার্বভৌমত্ব নিঃশেষ হতে চলেছে। চারদিকে ভয়াবহ এক নারকীয় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এক চরম ভীতির রাজত্ব কায়েম করে দেশকে সেই কলাঙ্কিত বাকশালী পন্থায় শোষণ করে চলেছে বর্তমান আওয়ামী সরকার। এই কালো চিত্র দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম ও বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের পেশকৃত প্রতিবেদনে নিয়মিত প্রতিফলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যে অপশাসনের বিরুদ্ধে ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে সেই একই দুঃশাসন আজ জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে। এই পটভূমিকায় আজকের দিনে ৭ নভেম্বরের গুরুত্ব অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

গণমাধ্যমের একাংশ ও বুদ্ধিজীবীদের একটি দলবাজ অংশের ক্রমাগত মিথ্যাচারের মাধ্যমে ইতিহাস বিকৃতির ফলে ৭ নভেম্বরের প্রকৃত আবেদন আজকের প্রজন্মের অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। এদিকে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কল্পিত গল্পগাথা তৈরি করে ৭ নভেম্বরের ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ও শক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে আড়াল করার অপচেষ্টায় সক্রিয় রয়েছে। “অথচ ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পূর্বেকার সময়ের অফিসারদের হত্যার পুরো ঘটনাটি ঘটায় জাসদ। সেনাবাহিনীর ভেতরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গড়ে তুলে জাসদ যখন ক্ষমতা কজা করতে চেয়েছিল, তখন জিয়াউর রহমানকে জাসদ তাদের নীলনকশায় অঙ্গুভূত করতে ব্যর্থ হয়ে সেদিন সেনাবাহিনীতে অফিসার হত্যা শুরু করে।”^১

এই নিবন্ধে নিজস্ব কোনো বয়ান পেশ না করে কেবল ঐতিহাসিক কিছু তথ্য ও সূত্র তুলে ধরে মহান ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও বাংলাদেশের নবজন্মের ঐ স্বর্গমুহূর্তকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন প্রজন্ম দেখিবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কিভাবে সময়ের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের নবজন্মকে সঙ্গে করে তুলেছিলেন।

মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক মহান স্বাধীনতার ঘোষণা:

মহান স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করে একটি মহল কর্তৃক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক অবদানকে অস্তীকার করার ঘটনা নতুন কিছু নয়। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার ঘোষণা তথা জাতির গোটা ইতিহাস নিয়ে ক্রমাগত মিথ্যাচার ও ইতিহাস বিকৃতি করে চলেছে। অথচ সেই সময়ের সকল ঐতিহাসিক দলিলে শহীদ জিয়ার মহান স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক ভূমিকার

^১ ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও জিয়াউর রহমান, আহমেদ মুসা সম্পাদনায়, ২০০২, ভূমিকাংশ।

অসংখ্য অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। শেখ মুজিব হত্যার পরে যাদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার প্রাণ ফিরে পায় তাদের মধ্যে অন্যতম সাবেক আওয়ামী লীগ নেতৃ আমেনা বেগম। তিনি ২৫ অক্টোবর ১৯৭৬ এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করেছেন।^২ একইভাবে প্রবাসী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কন্যা শারমিন আহমদ তাঁর “নেতা ও পিতা” বইতে স্বাধীনতার ঘোষণা কেন্দ্রিক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক সত্যগুলো তুলে ধরেছেন। নতুন প্রজন্ম এসব বক্তব্য ও লেখনী পড়লে প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে। এই নিবন্ধটিতে যেহেতু ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে তাই স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের সুযোগ এখানে নেই। পরবর্তীতে অন্য একটি প্রকাশনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। শুধু এটুকু বলা যায়- সেদিন জাতি যেভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল মুক্তির জন্য, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নির্দেশনা পাচ্ছিল না, দেশের পলায়নপর রাজনৈতিক নেতৃত্বে এহেন দিশেহারা অবস্থায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, রণক্ষেত্রের বীর সেনানী, সেক্টর কমান্ডার এবং জেড ফোর্সের প্রধান সে সময়ে চাকুরিত সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান জীবনের বুঁকি নিয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ‘We Revolt’^৩ বলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে বর্বরোচিত হত্যা ও আক্রমণের প্রাক্কালে বাঙালি জাতির জীবনে এক চরম ক্রান্তিকাল উপস্থিত হয়। সে সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাটে স্থাপিত অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নিজের অক্ষয় স্থান নিশ্চিত করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ‘বীর উত্তম’ খেতাব অর্জন করেছিলেন। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার ঘোষণার পরেই স্বাধীনতার জন্য সারাদেশে শুরু হয়েছিল ব্যাপক সামরিক তৎপরতা, প্রতিরোধ ও মুক্তির সংগ্রাম। ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণাই ছিল জাতির জন্য একমাত্র

^২ সাঞ্চাহিক বিচিত্রা, পঞ্চম বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৫ নভেম্বর ১৯৭৬; দ্বিতীয় পক্ষ: প্রেসিডেন্ট জিয়া: রাজনৈতিক জীবনী, মাহফুজ উল্লাহ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৬

^৩ গণপত্রের প্রাণপুরুষ জিয়া, লে. জে. মাহাবুবুর রহমান (অব.), কালোর কঠ অনলাইন (অ্যাকসেস-তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০২০)

আলোকবর্তিকা। প্রবাসী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের বক্তৃতাতেও জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার এই ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে তার ১০ এপ্রিলের ভাষণে জিয়াউর রহমানের কীর্তির কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, “এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কর্তৃপক্ষ। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।”^৪ তাজউদ্দীনের উপর্যুক্ত বক্তব্য ছাড়াও প্রবাসী সরকার বিভিন্ন সময় তাঁদের বক্তব্য ও বিবৃতিতে জিয়াউর রহমানের এই ঐতিহাসিক অবদানকে উল্লেখ করে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া অসংখ্য লেখনীতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণার অনেক দালিলিক প্রমাণ রয়েছে। ঘোষণা দিয়েই জিয়াউর রহমান ঘরে বসে থাকেননি। বিদ্রোহী সকল সেনা-কর্মকর্তা ও সিপাহীদের সংগঠিত করে স্বয়ং রণস্থলে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গড়ে তোলেন ঐতিহাসিক “জেড ফোর্স”।

মুক্তিযুদ্ধে ৭ নাম্বার সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব) কাজী নুর-উজ্জামান, বীর উত্তম তাঁর লেখা ‘একান্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা’ বইতে উল্লেখ করেন-

“২৬ তারিখ মধ্যাহ্ন আহারাদি সম্পদের পরে আমার কন্যাদ্বয় একটি ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে ছুটে এসে বললো কে যেন কোথা থেকে বাংলাদেশ সংক্রান্ত কিছু ঘোষণা দিচ্ছে। রেডিওর আওয়াজ ছিল খুবই ক্ষীণ। তবুও বুঝতে পারলাম যে, জিয়া নামক এক মেজর নিজেকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানাচ্ছেন। এই প্রচার যে কতবড় সুখবর ছিল তা বলা যায় না। বুঝলাম মুক্তিযুদ্ধ দানা বেঁধেছে। যেহেতু এই ঘোষণা একজন মেজর কর্তৃক দেয়া হয়, অতি সহজেই বুঝতে পারলাম বাঙালি সৈনিকেরা ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছে। প্রশ্ন জাগল এরা কারা এবং কোথায়? তাদের খোঁজ নেয়াটা এবং তাদের মিলিত হওয়াটাই আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল” (পৃষ্ঠা- ১১)। "...'৭১-এ এপ্রিলের শেষ দিকে তাজউদ্দীনের সঙ্গে আমি মেজর জলিলের নয় নম্বর সেক্টর

পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। যাত্রী আমরা দুজনেই ছিলাম। এই বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৫ খণ্ডের কোন এক খণ্ডে লেখা হয়েছে। তাজউদ্দীন সাহেবে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘আপনি একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর হয়ে কেমন করে কখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেন’। জবাবে আমি জিয়াউর রহমানের ঘোষণার কথা উল্লেখ করি” (পৃষ্ঠা- ১৪)।^৫

ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, স্বাধীনতাকালীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। এতে আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ২৬ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল ১৯৭১, মুজিবনগর সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত সময়পর্বে জিয়াউর রহমানের ঘোষণাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের মূল প্রেরণা। ২৫ মার্চ রাত থেকে মুজিবনগর সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যর্থতার খেসারত দেয়া থেকে জাতি রক্ষা পায় জিয়াউর রহমানের সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। এটি ছিল সমগ্র জাতির যুদ্ধ। আওয়ামী লীগ তা স্বীকার করতে চায় না। আওয়ামী লীগ বরাবরই মুক্তিযুদ্ধের একক মালিকানা গায়ের জোরে হলেও দখল করতে চায়। তাই তারা শহীদ জিয়ার অবদানকে যেমন অব্যাকার করতে চায়, অন্যদিকে তাঁকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকেও শুরু থেকেই কোনঠাসা করে রেখেছে। তাঁর অবদানকে কোনো দিন যোগ্য মর্যাদায় স্বীকার করতে দেখা যায়নি। তাই নিজেদের দলের লোকদেরও তারা ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে আড়াল করতে মিথ্যাচার করে আসছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান^৬ই সর্বপ্রথম ২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাতে বিদ্রোহ করেন। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রামে তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু করেন তিনি। স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ৬ জিয়াউর রহমান তাঁর নিজের লেখা ‘একটি জাতির জন্ম’ শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখেছেন, “সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানত। আমি

৫ 'একান্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা', কর্নেল (অব) কাজী নুর-উজ্জামান, বীর উত্তম, পৃষ্ঠা- ১১, ১৪।

৬ প্রেসিডেন্ট জিয়া: রাজনৈতিক জীবনি, মাহফুজ উল্লাহ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৫

সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশ্রম্ভ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিল। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না। কো-নো-দি-ন না।^৭ প্রবন্ধটি বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা পত্রিকা এবং পরবর্তীতে আবার ১৯৭৪ সালে সরকারি মালিকানাধীন সাম্প্রতিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের একটি অনন্য দলিল। ১৯৭২ সালে যখন এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় তখন শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় অবিসংবাদিত নেতা। আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। তারা কেউই জিয়াউর রহমানের এই লেখার সাথে দিমত পোষণ করেননি। কারণ জিয়াউর রহমানের বর্ণনা ছিল সন্দেহাতীত, প্রকৃত ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠিত সত্য।

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে তিনি আবার ফিরে গেছেন নিজের পেশাগত কাজে; যদিও স্বাধীন দেশে কর্মরত সেনা-কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যোর্ধন কিন্তু সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হলো তার জুনিয়র শফিউল্লাহকে। উচ্চমানের পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে জিয়াউর রহমান ঐ সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়েছিলেন। কোনো অপেশাদারী উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা তিনি কখনোই প্রভাবিত হননি। তার প্রমাণ তিনি তাঁর গোটা জীবনেই রেখেছেন। কেবল ইতিহাসের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে পরিব্রত পালন করার মধ্য দিয়েই তিনি ইতিহাসের নায়ক হয়ে উঠেন। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম মিশন প্রধান জে এন দীক্ষিত তাঁর *Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relations*^৮ বইতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে লিখেছেন-

Major Ziaur Rahman (who became President of Bangladesh in 1976-77), briefly captured the Chittagong radio station and broadcast

৭ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর লেখা এই প্রবন্ধটি দৈনিক বাংলা পত্রিকার ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ‘জবান’ ম্যাগাজিনের অনলাইন সংক্ষরণে পুনর্প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে এই অংশটি নেয়া হয়েছে।

a declaration announcing the establishment of free Bangladesh and appealing to all Bengali military and para-military personnel to resist the Pakistan army.”^৯

এই বিশ্বস্ততার প্রমাণ তিনি বারবার দিয়েছেন। একইভাবে যখন আওয়ামী লীগের একাংশ শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মতাবে হত্যার পরে ক্ষমতা দখল ও জেলহত্যা, সেনা-হত্যা চালিয়ে দেশকে গভীর অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছিল তখনও জিয়াউর রহমান একমাত্র সেনা-কর্মকর্তা যিনি সংবিধানকে সমৃদ্ধ রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন; অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান যাকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেছিলেন সেই জেনারেল শফিউল্লাহ সানন্দে শামিল হয়েছিলেন শেখ মুজিব হত্যাকারীদের দ্বারা গঠিত সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে।

মহান স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে জনমনে সৃষ্টি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার নায়কচিত্ত ভাবমূর্তি সংকীর্ণ দলবাজারা কখনও সুনজরে দেখেনি। সে কারণে ১৬ ডিসেম্বরের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে সুকোশলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ও জিয়াউর রহমানকে দূরে রাখা হয় বলে অনেকে মনে করেন। শত মিথ্যাচার ও প্রচার-সন্ত্রাস চালিয়েও জিয়ার এই ঐতিহাসিক সত্য ও শক্তিকে দমিয়ে রাখা যায়নি। নিজের সততা, পেশাদারিত্ব, দুরদর্শিতা ও কর্মনির্ণয়ে জিয়াউর রহমানকে আজ বাংলাদেশের ইতিহাস ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকারে পরিণত করেছে। তাই আজও উজ্জ্বল আলোক-মশাল হয়ে জাতিকে পথ দেখাচ্ছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তাঁর সেই দৃঢ় সংকল্পের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের মহান স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। ৭ নভেম্বরের শক্তি ও সংকল্প স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিরাজমান আওয়ামী সরকারের দলবাজী ও পর্বতপ্রমাণ দুর্বীলি ও নৈরাজ্যকে নাকচ করে দিয়েছিল। এই কারণে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়েই আওয়ামীলীগ ৭ নভেম্বরের সরকারি ছুটি বাতিল ঘোষণা করে। ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং জাতি গঠনে এই বিপ্লবের ভূমিকা আওয়ামী লীগ কখনোই মেনে নিতে পারেনি। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য হলো-সেদিন জিয়ার দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক ভূমিকাতে শুধু সেনা-হত্যাই বৃক্ষ হয়নি, বাংলাদেশ ফিরে পেয়েছিল তার হারানো প্রাণসন্তা- এক নবজীবনের। প্রকৃত ইতিহাসের আলোকে এই বিষয়গুলো এখন পরিষ্কারভাবে নতুন প্রজন্মের সামনে হাজির হওয়া দরকার।

৮ *Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relations* – J. N. Dixit, Page- 42.

৭২-৭৫ পর্ব: আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ, বাকশাল এবং তার পরিণতি

১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাশ করা হয় এবং কায়েম করা হয় একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী থেকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি হন শেখ মুজিবুর রহমান। গণতন্ত্রের কফিনে ঠুকে দেয়া হয় শেষ পেরেক। দলীয় সভায় ও জাতীয় সংসদে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানী, দেশের প্রধান সংবাদপত্র ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়ার পুত্র মইনুল হোসেন ও মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রলীগের প্রধান নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী'র মতো সংসদ সদস্যগণ বাকশালের ঘোর বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানান।^৯ পাকিস্তানে কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা এবং প্রবাসী সরকার প্রধান তাজউদ্দীন আহমদের অকাট্য দলিল ও সাক্ষ্য থাকার পরেও আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সমষ্ট অর্জনকে আত্মসাহ করার জন্য দলীয় বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াকে ব্যবহার করে চলেছেন। মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ ও আত্মানের মহিমার প্রতি বিদ্রূপ অব্যাহত রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন কন্যা শারমিন আহমদ লিখেছেন, “শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পরে একদিন তাজউদ্দীন আহমদের বাসায় আসলেন। গভীর মুখে শেখ মুজিব উঠে গেলেন দোতলায়। বাসার সবাই উচ্চস্থরে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুনতে পেলেন। তাজউদ্দীন বলছেন, ‘মুজিব ভাই, আজকে আমি আপনাকে যে কথাগুলো বলব, আমি জানি, আপনি সে কথাগুলো যুক্তি দিয়ে খণ্ডাতে পারবেন না। গণতন্ত্রকে হত্যা করে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একমাত্র রাজনৈতিক দল ‘বাকশাল’ গঠনের পরিণাম হবে ভয়াবহ। প্রশ্ন তুললেন, দলের হাতে অন্ত, দলীয় ক্যাডারদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আত্মীয়-স্বজন ও দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ সম্পর্কে আবু বললেন, মুজিব ভাই, এজন্যই কি আমরা ২৪ বছর সংগ্রাম করেছিলাম।’”^{১০}

সে সময়ে বাকশালে যোগদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের উপর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ অব্যাহত থাকে। যদিও সরকারি ঘোষণা ছিল যে কেউ ইচ্ছে করলে বাকশালে যোগদান করতে পারবে। “আসলে যোগ না দিয়ে কারণ নিষ্ঠার পাওয়ার

^৯ রঞ্জনী বাহীনির সত্য মিথ্যা, আনোয়ার উল আলম, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৩৪

^{১০} তাজউদ্দীন আহমদ: নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৪৫

উপায় ছিল না। ভিতরে ভিতরে সমস্ত সরকারি বেসরকারি দণ্ডে, স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল- সবাইকে ‘জাতীয় দল’-এ যোগ দেয়ার আবেদনপত্র সই করতে হবে। সর্বত্র বাকশালে যোগদানের একটা হিড়িক পড়ে গেলো।”^{১১} বর্তমানেও জীবন বাঁচানোর তাগিদে মানুষকে এ অন্যায় অবৈধ শাসনকে মেনে নিতে বাধ্য করার অপকৌশল নিয়েছে অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবী গোলাম মুরশিদের বিবরণ থেকেই সেই সময়ের চিত্রটি পরিষ্কার হয়- “গণতন্ত্রের কতগুলো রক্ষাকৰ্চ থাকে তা না হলে নির্বাচিত সরকার প্রধানও একনায়কের মতো আচরণ করতে পারে। যেমন হিটলারও নির্বাচিত চ্যাঙ্গেল ছিলেন, কিন্তু তার ফলে একনায়ক হতে তাঁর আটকায়নি। গণতন্ত্রের সবচেয়ে প্রধান রক্ষাকৰ্চ হলো পার্লামেন্ট। সে পার্লামেন্ট নিতান্ত একদলীয় হওয়ায় এবং সেখানে কোনো বিরূপ সমালোচনা না থাকায়, মুজিব যা খুশি তাই করার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা যে দ্রুত গতিতে বিকারের পথে এগিয়ে যায়, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণই ছিল এটা।^{১২} অন্যদিকে বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মহল বাংলাদেশকে অনেকার্থে নিজেদের একদলীয় রাজ্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকেই কিছু আওয়ামী সমর্থক ভাবাদর্শ হিসেবে ‘মুজিববাদ’কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। রাশিয়ান লেখক ভ্রাদিমির পুচকভের বই থেকে ছেট্ট এই অংশটুকুর দিকে নজর দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে- “বাস্তবে মুজিববাদ হিল বাংলাদেশি জাতীয় বুর্জোয়া ও অন্য সামাজিক স্তরগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্রুত করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের দ্বারা ব্যবহৃত মতবাদ। যেহেতু আওয়ামী লীগ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো ঠিক সেই কারণেই আওয়ামী লীগের তাত্ত্বিকরা শ্রেণিগত দৰ্দের প্রশ্ন এড়িয়ে মুজিববাদকে মূলত সম্পূর্ণ জাতিগত অর্থাৎ সকল শ্রেণির ভাবাদর্শমূলক প্লাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিল।”^{১৩}

^{১১} স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ (১ম খণ্ড), পিনাকী ভট্টাচার্য, ২০২০, পৃষ্ঠা- ৮০৫

^{১২} মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২০৪

^{১৩} বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা: ১৯৭১-১৯৮৫, ভ্রাদিমির পুচকভ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ৮৭

বাকশাল গঠনের বিষয়টি খোদ আওয়ামী লীগ ও রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বে থাকা লোকদের ভেতরেও তৈরি করে ব্যাপক অসংতোষ। রক্ষীবাহিনীর সাবেক উপপ্রধান আনোয়ার উল আলম'র 'রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা' বই ও অন্যান্য অনেক সূত্র থেকে জানা যায় যে সেদিন বাকশাল কায়েমের পরে শেখ মুজিবুর রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের আঙ্গুভাজন রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলম, সেখানে তাঁর সাথে বসে ছিলেন তারই সহকর্মী সারোয়ার। সে সময় সারোয়ার আনোয়ার উল আলমকে বলেছিলেন, "বঙ্গবন্ধু আজ গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরলেন"।^{১৪} এভাবে এক দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, সংসদ প্রধান এবং একদলীয় ব্যবস্থার একমাত্র প্রধান ক্ষমতাবান ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান নিজের দল ও সরকারের ভেতরেই প্রথম দিন থেকেই প্রকাশ্য ও গোপনে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন। আওয়ামী বাকশালী মহল তখন বিবাদমান বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যার সবই ছিল ক্ষমতাসীন দলের আন্তঃকোন্দলের ফসল। এই ধারাগুলি ছিল মূলত জাতীয় সংসদে বাকশালের প্রকাশ্য বিরোধীকারীদের ধারা, বাকশাল ও সরকার থেকে ছিটকে পড়া তাজউদ্দিনের সমাজতাত্ত্বিক ধারা, বাকশালে অন্তর্ভুক্ত মুজিব হত্যাকারীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক খন্দকার মোশতাকের ধারা ইত্যাদি। মূলত বাকশাল গঠনের পরে আওয়ামী লীগের ভেতর চলতে থাকা অন্তর্দৰ্শ চরমে পৌছে। সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে দেখা যায় যে সেই সময়ে আওয়ামী লীগে বিভিন্ন উপধারাগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম মিশন প্রধান জে এন দীক্ষিত তাঁর 'স্বাধীনতা এবং অতঃপর; ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক' বইতে এই বিষয়ে লিখেছেন-

তিনি (শেখ মুজিব) ধারণা করেছিলেন যে তাঁর দুই জন প্রধান সহকারী (যাঁরা মুজিবনগর সরকার গঠন করেছিলেন) তাজউদ্দীন আহমদ ও নজরুল ইসলাম হয়তো তাঁকে ভারতের সহযোগিতা নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন।^{১৫} এবং এই সন্দেহ থেকেই মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগদেরও মন্ত্রিপরিষদ ও বাকশাল গঠনের প্রক্রিয়ার বাইরে রাখেন। সেই সময়ে মূলত আওয়ামী বাকশালের

অভ্যন্তরীণ কোন্দলই রক্ষণাত্মক নির্মম পরিণতির দিকে নিয়ে যায় ক্ষমতাসীন দলটিকে। বাকশালের বাইরেও বিরোধী রাজনৈতিক ধারাসমূহ যেমন: ন্যাপ-ভাসানী, জাসদ ও সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে নবগঠিত একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

ইতোপূর্বে জাসদ ও জাসদ ছাত্রলীগের জন্মের পরেই মুজিববাদী ছাত্রলীগের দুই অংশ তোফায়েল ও মনি গ্রহণে বিভক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলে ৭ খনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যে রক্তাঞ্চ বিরোধে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও যুবলীগ মূলত দুরাবাইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যে অংশটি জাসদ নামে আবির্ভূত হয়, বাকশাল ছিল তাদেরই প্রচারিত মুজিববাদের নতুন সংস্করণ মাত্র। 'জাসদ রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসাবে 'বাকশাল'-এর বিরোধিতা করলেও এটা ছিল তাদের পূর্ববর্তী সাংগঠনিক কাঠামো মুজিব বাহিনীর আদর্শ 'মুজিববাদ'-এরই নতুন সংস্করণ মাত্র।^{১৬} ১৯৭২ সালের পর থেকেই দেশে আওয়ামী দুঃশাসন ও সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক দুরাবস্থার যাঁতাকলে দেশের মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে। সারা দেশে সৃষ্টি হয় এক অরাজক পরিস্থিতির। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দলে দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। জন্ম নেয় জাসদ, ভেঙে যায় ছাত্রলীগ, মুখোয়ুখি দাঁড়িয়ে যায় মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ। এই দলগঠনের মূল উদ্যোগীরা মূলত আওয়ামী লীগেরই বিকুল নেতা-কর্মী। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ'র সমাজতাত্ত্বিক ধারা এবং খন্দকার মোশতাকের ধারা এবং ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে আত্মায়নজনের ধারাতে আওয়ামী লীগকে বিভক্ত হতে দেখা যায়। এমনকি তাজউদ্দীন আহমেদকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়।^{১৭} এই ধারাসমূহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন্দলকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের পুরো বিষয়টি ছিল বাকশাল ব্যবস্থার পক্ষে বিপক্ষে একটি রক্ষণাত্মক কোন্দল ও সংঘাতের বাহিন্যকাশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বেনিফিশিয়ারি অংশটিই রাষ্ট্রীয় মধ্য দখল করেছিল। "সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের কল্লা চাই"- এই শ্লোগান দিয়ে মাঠের

১৪ রক্ষী বাহিনীর সত্য মিথ্যা, আনোয়ার উল আলম, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৩৩

১৫ স্বীকৃত অনুবাদ, Liberation on beyond: Indo-Bangladesh Relations, J.N. Dixit, UPL, 1999, Page-223

১৬ মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্গঠ, আলতাফ পারভেজ, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৩৯

১৭ তাজউদ্দীন আহমদ: নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১১৭

হঠকারী বিপ্লবী অংশ জাসদ ও কর্নেল তাহের ৭ নভেম্বর তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে হাজির হয় শেষ পর্বে।

৩ নভেম্বরের ঘটনার পর খন্দকার মোশতাকের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দল ১৫-র ১৫ আগস্টের রাতক্ষয়ী ঘটনার পরই থেমে যায়নি। খন্দকার মোশতাকই চার নেতাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন ১৮ উক্ত ঘটনা প্রবাহে বোৰা যায়, মূলত আওয়ামী লীগের মোশতাকপন্থী গোষ্ঠীর হাতে নিঃশেষ হয় মুজিবের বাকশালপন্থী এবং তাজউদ্দিন-মণি'র সমাজতান্ত্রিক ধারার নেতারা। যদিও ইতোপূর্বেই ফজলুল হক মণির বিরোধিতায় প্রবাসী সরকার প্রধান তাজউদ্দিন আহমেদকে বাকশালের কমিটিতে রাখা হয়নি এবং বাদ দেওয়া হয়েছিল সরকার থেকেও। আর সেনা পরিষদ নামের একটি গোপন সংগঠন করেকেজন মেজরের নেতৃত্বে সেনা বাহিনীর দ্রুটো ইউনিটকে ব্যবহার করে সংগঠিত করে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড। যাদেরকে ক্ষমতাসীন হয়েই খন্দকার মোশতাক আখ্যায়িত করেছিলেন “সূর্য সন্তান” হিসেবে।^{১৯} ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে এগুলো খোদ আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দলীয় ইতিহাস। ক্ষমতার মোহে তারা ভুলেই গেছে যে, ইতিহাস হচ্ছে ছাই চাপা আগুন যার সত্য একসময় না একসময় ছড়িয়ে পড়বেই। নিজেদের কোন্দলের ফলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে আওয়ামী লীগ এই বর্তমান সময়েও অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চর্চা করে আসছে।

রাজনীতিতে ব্যক্তিপূজার সংস্কৃতি বনাম রাষ্ট্রনায়কের মূল্যবোধ

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ শেখ মুজিবুর রহমান এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরপরই রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন শেখ মুজিবুর রহমানের অতি আস্থাভাজন বন্ধুপ্রতিম, দলীয় সহযোগী খন্দকার মোশতাক। বাংলাদেশে শুরু হয় মোশতাকের শাসন। মুজিবের দেশ হয়ে যায় মোশতাকের! “বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে জাতীয় পোশাক ঠিক হল। তাতে খন্দকার মুশতাক যে নেহের টুপিটি পরেন তাকেই জাতীয় টুপি বলে ঘোষণা করা হলো। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নয়, আইন শৃঙ্খলা নয়, টুপিটাই মন্ত্রী পরিষদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। প্রেসিডেন্ট মুশতাক মিনিস্টারদের অনেককে টুপি উপহার দিলেন”- মাহাবুব

^{১৮} তিনটি সেনা অভ্যর্থনাও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৭

^{১৯} প্রথম আলো, মুজিব হত্যা, খুনী মেজররা ও আমাদের ঝিচারিতা- সোহরাব হাসান, ১৩ আগস্ট, ২০১৮

তালুকদার।^{২০} জাতীয় টুপি ঘোষণার এই বিষয়টি অনেকেই খুব হাস্য-রসাত্মক ও হালকাভাবে বিশ্লেষণ করে থাকেন। তবে ব্যাপারটি তেমনটা মোটেও নয়। এই ঘটনা থেকেই তৎকালীন শাসকদের ব্যক্তিপূজার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। সেটা হল ‘ব্যক্তিপূজার সংস্কৃতি’ চালু করা।

১৪ আগস্ট পর্যন্ত মুজিব কোট পরা মন্ত্রীরাই ১৫ই আগস্টের পর মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিল, পরে নিল কিঞ্চি টুপি। একই দল, একই মন্ত্রিসভা, শুধু ভিন্ন সভাপতি।^{২১} দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে, বাংলাদেশ জন্মের পর থেকেই শাসকমহল সমাজের রক্ষে রক্ষে নিজেদের ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দিতে একক ব্যক্তিচরিত্রকে পূজণীয় চরিত্রে রূপান্তরিত করে এসেছে। অর্থচ একজন গণতান্ত্রিক শাসকের চরিত্র হবে সার্বজনীন, তিনি নিজের কোনো ব্যক্তি চিহ্ন নয় বরং নিজের কাজকে এবং কাজের সুফলকে ছড়িয়ে দিবেন রাষ্ট্রের রক্ষে রক্ষে। এটাই তাঁর কাজ আর এর মাধ্যমেই তিনি জনগণের হৃদয়ে আস্থা অর্জন করে থাকেন। যেমনটি করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। আর সে কারণেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের জনগণের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন।

৩ নভেম্বর ও খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ কু

জেলহত্যা ও ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডসহ মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদের বাঁচিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগেরই নেতা মোশতাক মূল ভূমিকা পালন করেন। যদিও এটা নিয়েও আওয়ামী লীগ মিথ্যাচার ও ইতিহাস বিরুতিতে সোচ্চার। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের ঘরের লোক তাজউদ্দীন আহমেদের জ্যেষ্ঠ কন্যা শারমিন আহমদ লিখেছেন, “১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্মভাবে নিহত হন। বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন তার মন্ত্রিসভা ও বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও জুনিয়র আর্মি অফিসাররা ক্ষমতা দখল করে। অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতির পদ দখলকারী মোশতাক অর্ডিন্যাস জারি করে যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না।”^{২২} শারমিন আহমদের লেখা থেকে আরও পরিকারভাবে জানা যায়, “বঙ্গভবন হতে খন্দকার মোশতাক ও মেজর আব্দুর রশিদের নির্দেশে এই বর্বর

^{২০} মোশতাকের জাতীয় পোশাক॥ বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, মাহবুব তালুকদার, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৫৫-১৫৬

^{২১} তিনটি সেনা অভ্যর্থনাও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৯৯

হত্যাকাণ্ড (জেল হত্যাকাণ্ড) সংঘটিত হয়। এই দুইজন হত্যাকারীদের জন্য জেলগেট খুলে দেওয়ার জন্য কারাগারের আইজিকে হকুম দেয়। বিগেডিয়ার আমিনুল হক, যাকে খালেদ মোশাররফ জেল হত্যার তদন্তে নিয়োগ করেছিলেন তিনি এই তথ্য আমাকে ১৬ই জুন ১৯৮৭ সালে এক সাক্ষাতে দিয়েছিলেন।^{২৩}

১৯৭৫ এর নভেম্বরে ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি আবির্ভূত হন তৎকালীন চিফ অব জেনারেল স্টাফ বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পরেও অনেকে মনে করেন যে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডে ছিল তার প্রাচুর্য ভূমিকা। বর্তমান আওয়ামী লীগের বর্ণিত ইতিহাস প্রকল্পে তাকে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলেও কর্নেল (অবঃ) এম এ হামিদের ‘তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা’ বই থেকে জানা যায়, আদতে খালেদ মোশাররফ ছিলেন মুজিব হত্যার অন্যতম প্রধান কুশিলব মেজর ফারুকের মামা এবং তৎকালীন সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি।^{২৪} সে সময় ক্যান্টনমেন্টে ফারুকের মত একজন জুনিয়র অফিসারের সকল ক্ষমতার উৎস ছিল তাঁর মামা বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। সবার আড়ালে ফারুকের সব রকম নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিয়েছেন তিনি। ফারুকের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিকারভাবে অবগত ছিল তাঁর মামা।^{২৫} এমনকি, মেজর রশিদ ভারত থেকে একটি কোর্স শেষে দেশে ফিরে যশোরে পোস্টিং পান কিন্তু ফারুকের পরিকল্পনার কথা জেনে রশিদকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, যা খোদ ফারুকেরই ভাষ্যতে উঠে এসেছে।^{২৬}

এসব ঘটনাপ্রবাহ থেকেই বোঝা যায় যে বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ছিলেন সুযোগসন্ধানী ক্ষমতাপিপাসু একজন সামরিক কর্মকর্তা। হত্যাকাণ্ডের পরিণাম যাই হোক না কেন, সেনাবাহিনীতে সর্বেস্বর্বী হওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এ জন্য তিনি যে কোনো রকমের ক্যু অথবা বিদ্রোহকে উক্তে দিতেও পিছপা হননি। সে কারণেই দেখা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতার লড়াইয়ে মোশতাকের ঘাড়ে তিনিই নিশ্চাস ফেলেছিলেন। কর্নেল হামিদের উক্ত বই থেকে

২২ তরা নভেম্বর: জেল হত্যার পূর্বাপর, শারমিন আহমদ, ঐতিহ্য, ২০১৪, ভূমিকাংশ

২৩ তরা নভেম্বর: জেল হত্যার পূর্বাপর, শারমিন আহমদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৩

২৪ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৫৯

২৫ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৪

২৬ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৫

আরও জানা যায় যে, খালেদ মোশাররফ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের অতি আপনজনদের একজন। মুজিবের বাসায় তার অবাধ যাতায়াত ছিল। ধারণা করা হয় যে, জেনারেল শফিউল্লাহর পর শেখ মুজিব তাকেই সেনাপ্রধানের পদ দিতেন।^{২৭}

তবে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান না করে তৎকালীন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ২৪ আগস্ট সেনাপ্রধান নিয়োগ দেন মোশতাক সরকার, যে সিদ্ধান্ত ছিল মূলত জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে।^{২৮} কিন্তু এই সিদ্ধান্তে বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নিজেকে বঞ্চিত ভাবলেন^{২৯} এবং জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে নানাবিধ ঘড়িয়াল্টে লিপ্ত হলেন। জেনারেল জিয়ার সেনাপ্রধান নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে এখনও অনেকেই জলঘোলা করে থাকেন। শেখ মুজিব হত্যার পর সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় জিয়াউর রহমানকে বেনিফিশিয়ার হিসেবেও প্রচার করার অপচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে বাস্তবতা হল, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর জন্মলগ্নেই জ্যৈষ্ঠতম কর্মকর্তা ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। আর সেই জ্যৈষ্ঠতার কারণেই তাকে সেনাপ্রধানের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে মোশতাক জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধান নিয়োগ দিলেও মুজিব হত্যায় জেনারেল জিয়ার কোনো ভূমিকা না থাকায় মোশতাক ছিলেন তার প্রতি সন্দিহান। এদিকে একজন পেশাদার ও ব্যক্তিসম্পন্ন জিয়াউর রহমানও খন্দকার মোশতাককে পছন্দ করতেন না।^{৩০} আর এই দুন্দের ফলেই জিয়াকে সেনাপ্রধানের পদ দিলেও মোশতাক সেনাপ্রধানের উপরে আরও দুটো পদ সৃষ্টি করেন, প্রথমটি ছিল মোশতাকের সামরিক বাহিনীর উপদেষ্টার পদ যেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন জেনারেল ওসমানী; অন্যদিকে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে দেয়া হয় সেনাপ্রধানদের উপরের পদ, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ। এভাবে সেনাপ্রধান বানানোর পরেও প্রক্রতিপক্ষে জেনারেল জিয়াকে নিয়ে করে রেখেছিলেন খন্দকার মোশতাক। এর মাঝে ক্ষমতার দৌড়ে পিছিয়ে থাকতে চাইলেন না বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। অতঃপর বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর কর্নেল

২৭ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৬

২৮ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৪১

২৯ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৭২

৩০ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৯৬

শাফায়াত জামিলের ৪৬ বিগ্রহে নিয়ে অভ্যর্থনান করলেন যা তাকে তিনি দিনের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। ৪৬ বিগ্রহের জুনিয়র অফিসারদের দিয়ে বন্দি করলেন সেনাপ্রধান জিয়াকে।^{৩১} কিন্তু জিয়া সে সময় সৈনিকদের মধ্যে ছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয়। তাঁর বন্দি হওয়ার খবরে প্রচণ্ড স্কুল্য হয় গোটা সৈনিক মহল।^{৩২} এরই মাঝে ঘটতে থাকে খন্দকার মোশতাক এবং খালেদ মোশাররফের ক্ষমতা নিয়ে দর কষাকর্ষি। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মূল অনুষ্ঠটকের ভূমিকা পালন করার পরেও খন্দকার মোশতাক খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান না করে জ্যেষ্ঠতম পেশাদার জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করায় খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে খালেদ মোশাররফের আক্রেশ তৈরি হয়। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে খালেদ মোশাররফের অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে।

ইতোমধ্যেই মোশাররফের অভ্যর্থনার সংবাদের পরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাকশাল ছাত্রলীগের মিছিল এবং ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে খালেদ মোশাররফের ভাই আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ ও তাদের মাঝের নেতৃত্বে খালেদ মোশাররফের অভ্যর্থনার পক্ষে একটি সংহতি মিছিল বের করা হয়। ভারতীয় বেতার কেন্দ্র আকাশবাণী থেকে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সেনাবাহিনী তথা দেশবাসীর কাছে খালেদ মোশাররফের অভ্যর্থনান বাকশাল ও ভারতপঞ্চি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। অপরদিকে এই সময়েই খালেদ মোশাররফের ভাগে মেজর ফারুকসহ ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকারীদের বিদেশ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়।^{৩৩} কর্ণেল হামিদ তাঁর ‘তিনিটি সেনা অভ্যর্থনান ও কিছু না বলা কথা’ বইয়ে স্পষ্টভাবেই এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। অপরদিকে মোশতাকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কৌশলী খালেদ মোশাররফ যে মাথা নিচু করে আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ পাঠ করেছিলেন তারও উল্লেখ আছে একই বইয়ে।^{৩৪} এই তথ্যসমূহই প্রমাণ করে, ৩ নভেম্বরের অভ্যর্থনান ছিল মূলত খালেদ মোশাররফের উচ্চাভিলাষ পূরণ করার জন্য। ৩ নভেম্বরের অভ্যর্থনানের পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা গেল না। একদিকে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমাত্ত ভঙ্গ করেছিলেন,

^{৩১} তিনিটি সেনা অভ্যর্থনান ও কিছু না বলা কথা, কর্ণেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১০০
^{৩২} সৈনিকদের মাঝে জিয়ার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তাঁর বন্দিত্বে হতাশ এবং স্কুল্য গোটা সৈনিক মহল।^{৩৩} তিনিটি সেনা অভ্যর্থনান ও কিছু না বলা কথা, কর্ণেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১০৩
^{৩৩} তিনিটি সেনা অভ্যর্থনান ও কিছু না বলা কথা, কর্ণেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১০৫
^{৩৪} তিনিটি সেনা অভ্যর্থনান ও কিছু না বলা কথা, কর্ণেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১১০

অপর দিকে মোশতাক সরকারকে অনুমোদন দিয়ে মুজিব হত্যাকাণ্ডে তার পৃষ্ঠপোষকতামূলক ভূমিকাকে পুনরায় নিশ্চিত করেছিলেন খালেদ মোশাররফ। যা ছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী শাসক গোষ্ঠীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির একটি পরম্পরা। কিন্তু খালেদ মোশাররফপঞ্চি ও কিছু আওয়ামী বয়ানকারীরা এই তথ্য সমূহকে মিথ্যাচারের মাধ্যমে আড়াল করে ৩ নভেম্বর অভ্যর্থনানকে “মহান ঘটনা” হিসেবে প্রচার করে থাকে। এটি মূলত প্রকৃত ইতিহাস বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিকে খালেদ মোশাররফের কল্য মাহজাবিন খালেদকে জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্য মনোনীত করে আওয়ামী লীগও এই স্ববিরোধিতার কৃটকোশলের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

জাসদ ও তাহের প্রসঙ্গ

ইতিহাস বলে জাসদ মূলত আওয়ামী লীগেরই একটি ভগ্নাংশ। অন্যদিকে কর্ণেল তাহের অবসরে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর ক্ষিণ হয়ে যুক্ত হন জাসদের রাজনীতির সাথে। ১৯৭৪ সালে শুরু করেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠনের কাজ। এই সংস্থা মূলত সৈনিকদের ভেতরে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। প্রচার প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সৈনিকদের ভর্তি করা হতো এই সংগঠনে। বলা হয়ে থাকে, তাহের ছিলেন একজন রোমান্টিক সমাজতন্ত্রী। সামরিক জীবনে ছিলেন একজন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা। ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছ্বর্ষণ ও আবেগপ্রবণ। ডা. শাহাদুজ্জামান রচিত তাহেরের জীবনী ভিত্তিক উপন্যাস ‘ক্রাচের কর্ণেল’ এছে তাঁর বিয়ের ঘটনা উল্লেখ আছে, যেখানে তিনি বন্দুকের গুলি ফুটিয়ে উৎসব করতে করতে বরযাত্রী নিয়ে রওনা হন। যদিও রোমান্টিক বামপঞ্চি মহলে ব্যাপারটিকে রোমান্ধের সহিত বর্ণনা করা হয়। গুলি ফুটিয়ে বিয়ে করতে যাওয়ার মত এহেন উচ্ছ্বসপ্রবণ কার্যকে খোদ শাহাদুজ্জামান খুবই নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন তার উপন্যাসে। সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা হিসেবে এরকম গুলি ফোটানোর মত কাজ ও আচরণকে মহান চোখে দেখার কিছু নেই। ব্যক্তি জীবনে এমন আবেগ চর্চাকারী মানুষের রাজনৈতিক জীবন কর্তৃতা দায়িত্বশীল হতে পারে সে প্রশ্নই তো স্বাভাবিক। রোমান্টিক বিপ্লবীপনায় ভরপুর তাহের ছাত্রজীবনেই বাম রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তবে রাজনৈতিক জীবনেও তিনি ছিলেন খুবই বিশৃঙ্খল এবং দোদুল্যমান স্বভাবের। তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যাবার পরপরই সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে আই.ডাব্লিউ.টি.এ তে কর্মরত অবস্থায় জাসদের সাথে যুক্ত হন। একই সময় তিনি

সর্বহারা পার্টির সাথেও যুক্ত থাকেন।^{৩৫} রাজনৈতিক মতবাদে তিনি একজন রোমান্টিক সমাজতন্ত্রী হলেও আদতে ছিলেন একজন স্বৈরাচারী স্বভাবের মানুষ। জাসদের সাথে তাহেরের সংশ্লিষ্টতা হয় তার ছোট ভাই আনোয়ারের মাধ্যমে। কর্নেল তাহের জাসদের সাথে রাজনীতি করলেও তিনি মূলত শেখ মুজিবের উৎখাত চাইতেন- এর প্রমাণ পাওয়া যায় কর্নেল তাহেরের সাথে মেজর ডালিম এবং অন্যান্য হত্যাকারীদের সাথে যোগাযোগের সূত্র ধরে। তিনি যখন গণবাহিনী গঠন করছিলেন তখন শেখ মুজিবের হত্যাকারী নূর এবং ডালিমের সাথেও তিনি নিবড় যোগাযোগ রাখতেন। তাহের ও ডালিমের চিন্তাধারা ছিল একই রকম।^{৩৬} মূলত তাহেরের লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা। মুজিব উৎখাতের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে যেই রাজনৈতিক শক্তি যখন কাজে লেগেছে সেটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। কখনও সর্বহারা পার্টি, কখনও ডালিম-ফারহক প্রমুখ, আর শেষতক জাসদ। এমনকি নিজের ছোট ভাইয়ের নেতৃত্বে ঢাকাত্ত তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনারকে জিমি করার ব্যর্থ চেষ্টাও করেছেন তিনি। ৭ নভেম্বর বিপ্লবের দিন মূলত জিয়ার কাঁধে বন্দুক রেখে ক্ষমতায় আসার স্পন্দনে বিভোর ছিলেন কর্নেল তাহের।

অন্যদিকে জিয়া দৃঢ়ভাবে তাঁর রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। জিয়ার কাঁধে চেপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্পন্দন সফল হয়নি তাহেরের। তার পরিবার তথা আনোয়ার-ইনু গং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নানাভাবে দোষারোপ করে থাকে। অপরদিকে বর্তমান আওয়ামী জোট ও তার প্রচার বাহিনী বাংলাদেশের রাজনীতিতে গায়ের জোরে বিএনপি ও জিয়াকে খারিজ করতে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড, ও ৭ নভেম্বরের জেলহত্যাকাণ্ড এবং ৭ নভেম্বরের সেনাবাহিনীর অফিসারদের হত্যাকাণ্ড- এর সকল প্রকৃত হত্যাকারীদের একযোগে আড়াল করার চেষ্টা করছে এবং নিজদেরকে শেখ মুজিবভুক্ত প্রমাণ করতে ইতিহাস বিকৃত করে চলছে।

দেশি-বিদেশি নানা লেখকের লেখার মাধ্যমে জাসদ ও তাহেরের সকল গর্হিত কাজকে আবেগের সহিত বৈধতা দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে জনাব আলতাফ পারভেজ তার লেখায় আলোকপাত করেছেন- “জাসদ ও সংশ্লিষ্ট ইতিহাস অনুসন্ধানের

ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হল লরেন্স লিফশুলংজের ‘বাংলাদেশ: দ্যা আনফিনিশড রেভুলুশন।’ লিফশুলংজের নাতিদীর্ঘ ঐ পুষ্টিকা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের এক উত্তাল সময়ের অসামান্য এক ডকুমেন্টেশন। কিন্তু একই সঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধানে এই ডকুমেন্টেশন এক মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত প্রতিবন্ধকতাও। ঘটনাবলির ব্যানে লিফশুলংজ প্রচুর আবেগও মিশিয়ে দিয়েছেন- যা ঐ সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও তাৰৎ পাঠককে অন্ধ হাতি দেখানোর মতো দশকের পর দশক পথ দেখিয়ে চলেছে।”^{৩৭}

এই সব লেখকদের ব্যানের উপর ভর করে ইতিহাস ও সাহিত্য সৃষ্টি করে দেশের এক শ্রেণির তথাকথিত লেখক-বুদ্ধিজীবি সংস্কৃতিকভাবে ফ্যাসিবাদী রাজনীতিরই সেবা করে চলেছেন। এই উপনিবেশী মানসিকতা থেকে বের হয়ে এখন সময় হয়েছে- প্রকৃত ইতিহাসকে জনগণের সামনে হাজির করার। তাই আমরা এখানে ইতিহাসের আলোকে ৭ নভেম্বরে তাহেরের প্রকৃত ভূমিকা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

জাসদ ছিল স্বাধীনতার পরপরই আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি শক্তি। জাসদ মূলত ছাত্রদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয় হলেও দেশের সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে কতটা সফল হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যার ফলে গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মত অনিয়মতাত্ত্বিক সংগঠনের দিকে তারা ঝুঁকে পড়ে। কর্নেল তাহের ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ক্ষমতার পালা বদলকে আঁচ করতে পেরে জাসদকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। জিয়া ও তাহেরের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল কেবলই তাহেরের একতরফা দাবীতে। তাহের ছিল শুধু মাত্র জিয়ার একজন সাবেক সহকর্মী, যিনি তাঁর কাঁধে বন্দুক রেখে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।^{৩৮} মূলত জিয়াউর রহমানের বন্দি হওয়ার ফলে সাধারণ বিপ্লবী সৈনিকদের মাঝে তাহের তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করে। তিনি ক্যান্টনমেন্টে তাঁর অনুগত কিছু সৈনিক ও জাসদের কর্মীদেরকে রাস্তায় নামিয়ে পুরো বিপ্লব এবং ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমানের অনুগত সাধারণ সৈনিকের সংখ্যা ছিল অগণিত। তারা স্বতঃকৃত জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করার জন্য সমবেত হতে থাকলে তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক

৩৭ মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী, আলতাফ পারভেজ, ২০১৫. পৃষ্ঠা-১৫

৩৮ তিনটি সেনা অভ্যর্থনা ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবং এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৮৪

সংস্থার নগণ্য সদস্যরা রণে ভঙ্গ দেয়। ব্যর্থ হয় তাহেরের বিপুরী সেনা সংস্থার সমাজতাত্ত্বিক বিপুরের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পরিকল্পনা, বিজয় লাভ করে সিপাহী-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিপুর।

বিপুরী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে কর্ণেল তাহেরের এতজন অফিসারের হত্যাকাণ্ডকেও অনেকে বিপুরী কর্মকাণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে! সে সময় সেনা অফিসারদের হত্যায় তাহেরের প্রধান দায় ছিল অনন্ধীকার্য। সে কারণে যথানিয়মে কর্ণেল তাহেরের ফাঁসির আদেশ হলে সেটা নিয়েও জিয়াউর রহমানকে দোষারোপ করা হয়। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে ৭ নভেম্বর পরবর্তী হত্যার শিকার হওয়া এতজন সেনা অফিসারের লাশ আর রক্ত। এই সকল আওয়ামীপন্থীদের কাছে অর্থহীন! অথচ ১৫ ই আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর কর্ণেল তাহের শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দাফন নিয়ে বলেছিলেন, “শেখ মুজিবকে কবর দিতে অ্যালাও করা ঠিক হয়নি। এখন তো সেখানে মাজার হবে। উচিং ছিল লাশটা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া”।^{৩৯} তথ্যটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে মহিউদ্দিন আহমদের ‘জাসদের উত্থান পতন’ বইয়ে। এই বইয়ের লেখক নিজেও জাসদের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি আরও একটি আলোচিত বই লিখেন ‘বিএনপির সময় অসময়’^{৪০} (প্রকাশকাল: ২০১৬) নামে। এই বইয়ের ১৬০ থেকে ১৬৩ পৃষ্ঠায় কর্ণেল তাহের সম্পর্কিত অনেক তথ্য উঠে এসেছে তা এক নজরে দেখে নেয়া যাক-

“তাহেরের ফাঁসির রায় হল, ফাঁসি হল। তবে এটা জিয়ার একক সিদ্ধান্ত ছিল না। এর পেছনে সেই সময়ের সামরিক বাহিনীর সব কর্মকর্তারই সায় ছিল।”

“কারণ তাহেরের সশঙ্ক বিপুরীদের হাতে বারোজন সেনা কর্মকর্তা সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা তারা ভুলতে পারেন।”

“মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার তো দাবিই করেছিলেন, ফাঁসি না দিলে তিনি কোমরের বেল্ট খুলে ফেলবেন, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেবেন।”

^{৩৯} শেখ মুজিবের লাশ দাফন নিয়ে তাহেরের বক্তব্য॥ জাসদের উত্থান পতন: অঙ্গীর সময়ের রাজনীতি, মহিউদ্দিন আহমদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৭৯

^{৪০}‘বিএনপির সময় অসময়’- লেখক, গবেষক- মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৬০-১৬৩।

“ওই সময় সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তা তাহেরের পক্ষ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তবে তাহেরের ফাঁসি নিয়ে জিয়ার মধ্যে অপরাধবোধ বা মর্মবেদনা থাকতে পারে।”

কিন্তু একজন জিয়াউর রহমান জাসদ নেতৃবৃন্দ ও কর্ণেল তাহেরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক আচরণ করেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ লিখেন-

“জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার আদেশে তাহেরের পরিবারের জন্য ঢাকার লালমাটিয়ায় একটা আবাসিক পুট বরাদ্দ করা হয়। তাহেরের পরিবার সেটা সাচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন।”

“তাহেরের স্ত্রী এবং তাহেরের বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে জিয়ার আদেশে পরিবার পরিকল্পনা অধিদণ্ডের চাকরি দেয়া হয়েছিল। তারা সেটি গ্রহণও করেছিলেন।”

“জিয়ার সঙ্গে জাসদের সব ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের সবাইকে এক এক করে ছেড়ে দেন। অন্ত আইনের যাদের বিরুদ্ধে মামলা ছিল, তাদের অনেকেই সাধারণ ক্ষমা পেয়ে ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশও নেন এবং জয়ী হন-পুনর্বাসিত হয়ে যান।”

“তাহেরের অনুজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং জাসদ-গণবাহিনীর ঢাকা নগরের কমান্ডার আনোয়ার হোসেনের ১০ বছরের সাজা হয়েছিল। তিনিও সাজার মেয়াদ অর্ধেক ভোগ করে ছাড়া পান।”

“জিয়াউর রহমান আনোয়ারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ফিরিয়ে দেন। মজার ব্যাপার উনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চুকেই শিক্ষক রাজনীতিতে আওয়ামী বিরোধী ‘গোলাপি’ দলে যোগ দেন।”

“পরে জিয়াপন্থীরা ‘গোলাপি’ দল ভেঙে ‘সাদা’ দল বানালে আনোয়ার সাদা দলে যোগ দেন এবং ওই দলের সমর্থনে সিডিকেট নির্বাচনে অংশ নেন। ১৯৯৬ সালে তিনি আওয়ামীপন্থী নীল দলে নিজেকে সমর্পণ করেন।”

“তাহেরের বড় ভাই সার্জেন্ট (অবঃ) আবু ইউসুফ সামরিক আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। চার বছর না পেরোতেই জিয়ার কৃপায় আবু ইউসুফ ছাড়া পান।”

“৭ই নভেম্বর (১৯৭৫) অভ্যুত্থানের পর জলিল-তাহেরদের বিরুদ্ধে ঢাইবুনালে যে সাজা দেয়া হয়েছিল, তাদের কাউকেই বেশি দিন জেলে থাকতে হয়নি।”

“জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রবের ১০ বছরের সাজা হয়েছিল। তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে জিয়া পশ্চিম জার্মানিতে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সরকারি খরচেই জার্মানিতে রবের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল।”^{৪১} জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন ছিল বিভিন্ন নয়, প্রতিহিংসা নয়, এক্যবন্ধভাবে জাতি গঠনের কাজে যার যার সামর্থ্য ও অবস্থান অনুযায়ী দেশের জন্য কাজ করতে উদ্বৃদ্ধ করা। এই উদারতার সুযোগ নিয়ে সুবিধাভোগী ও ক্ষমতালিঙ্গু চক্রটি জিয়াউর রহমানকে বারবার হেয় প্রতিপন্থ করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বর্তমানে শেখ মুজিবুর রহমানের খুনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ও আনন্দ মিছিলকারী চক্রটি আওয়ামী লীগের অবৈধ ক্ষমতার মিত্রস্তি হিসেবে হাজির হয়েছে।

কর্ণেল তাহের মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এতোটা বীতশুন্দ থাকার পরেও বর্তমানে আওয়ামীপন্থী অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী, যারা নিজেদের মুজিবপ্রেমী দাবী করেন তারাই তাহেরকে হিরো হিসেবে দাঁড় করিয়ে জিয়াকে ভিলেন বানানোর কাণ্ডে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এদের অনেকেই মশগুল থাকেন তাহের বন্দনায়! এই দিচারিতা নিয়েই তাহেরের ঘনিষ্ঠিতম জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু আওয়ামী জোটের মন্ত্রী দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে অন্যতম নীতি নির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আওয়ামী ইতিহাস প্রকল্পের মিথ্যাচারকে চিহ্নিত করতে এসকল তথ্যই যথেষ্ট নয় কি?

জেনারেল জিয়াউর রহমান সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের ও আওয়ামী লীগের পরম্পরবিরোধী বক্তব্য

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার পূর্বকালীন বাংলাদেশের সমাজ চিত্রটা আবার একবার দেখে নেয়া যাক। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের মহান মাতৃভূমি, বাংলাদেশের জন্ম। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ- নতুন সরকার, নতুন নাগরিক। নতুন-রাষ্ট্র সুন্দরভাবে জীবনযাপনের যে স্থপ্ত তা ক্রমে ফিকে হতে শুরু করে। বিপুল আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে শাসক শ্রেণির আচরণে জাতি হয়ে ওঠে হতাশাহ্রাস্ত। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই ক্ষমতালোভী রাজনীতি, হানাহানি, গুম, খুন, আন্তঃকোন্দল, দূর্জ্ঞাতি, দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষ ক্রমে গ্রাস করে নিচ্ছিল আমাদের প্রিয়

^{৪১} ‘বিএনপির সময় অসময়’- লেখক, গবেষক- মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ২০১৬, পঢ়া- ১৬০-১৬৩।

স্বদেশ। স্বাধীনতার পরপরই বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটি দেশকে নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরণ-যুবা, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-সিপাহী সবাই স্বাধিকার আর মুক্তির যে স্থপ্ত বুকে নিয়ে অকাতরে জীবন বাজি রেখেছিল, স্বাধীন দেশে সেই স্থপ্ত একক ‘ব্যক্তি-ক্ষমতা’র নিকট জিম্মি হয়ে পড়ে। চারিদিকে শুরু হয় হাহাকার আর হতাশার করণ আর্তনাদ। তরণদের চাকরি নেই, কৃষকের গোলায় ফসল নেই, নেই চিকিৎসা-শিক্ষার সমান সুযোগ। সমাজের সর্বস্তরেই কেবল ক্ষমতার দাপট। বাক-স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রকে হত্যা করে চাপিয়ে দেয়া হয় একদলীয় বাকশাল শাসন। এই শাসনতাত্ত্বিক ব্যর্থতাকে আড়াল করতে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জন্মালগ্ন থেকেই কল্প কাহিনী ও মিথ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অথচ ইতিহাস প্রমাণ করে, আওয়ামী অরাজকতার ফলে তাদের নিজেদের একাংশের হাতেই ১৫ আগস্ট নৃৎসংহিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, এবং তার পরে দেশে যে গভীর সংকট তৈরি হয় তা থেকে জাতিকে উত্তরণের কাঞ্চারি হিসেবে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে হাজির হয়েছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ৭৫ এর পর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পুনঃপ্রবেশও ঘটেছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় গণতন্ত্রের হাত ধরে।

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের জন্মের সাথে নিবিড়ভাবে প্রোথিত একটি নাম, একটি অধ্যায়, একটি ইতিহাস। তাঁর গৌরবময় ভূমিকাকে কলংকিত করার জন্য আওয়ামীলীগ এবং এর chauvinists সমর্থকগোষ্ঠী মিথ্যার বেসাতি দিয়ে ইতিহাস সাজানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। দুঃখজনকভাবে শহীদ জিয়াউর রহমানকে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রমাণ করার মড়যন্ত্র চলছে প্রতিনিয়ত। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমানের নাম জড়িয়ে যে মিথ্যা কল্পকাহিনী/বক্তব্য আওয়ামীলীগের তরফ থেকে দেওয়া হয় তা শুধু ভিত্তিহীন, বানেয়াট এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই নয়, সেটা শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার রায়েরও পরিপন্থী। এমনকি মুজিব হত্যার তদন্ত প্রক্রিয়া ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্ক হয়ে রায় কার্যকরী হওয়ার পরেও এই অপপ্রচার তারা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিমকার্ট প্রদত্ত উক্ত রায় ল জার্নাল ADC Special Issue ২০১০ এ প্রকাশিত হয়েছে।^{৪২} উক্ত রায়ে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অভিযন্তার তালিকায় জিয়াউর রহমানের নামই নেই। তাহলে প্রশ্ন হলো, আওয়ামীলীগ কি এই রায়ও মানতে চায় না? এদিকে গণমাধ্যমের কিছু সরকারি সুবিধাবাদী অংশ ইতিহাস বিকৃতির এই প্রকল্পের হাতিয়ারের দায়িত্ব

পালন করছে।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সেনাপ্রধান হওয়ার পর থেকেই জেনারেল জিয়া নীরবে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় শেখ মুজিবের হত্যাকারী মেজরদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার একটি প্রক্রিয়া শুরু করছিলেন তিনি। এ কারণে সেনা পরিষদের (শেখ মুজিব হত্যাকারীদের সংগঠন) অফিসাররা জিয়াউর রহমানের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলে অনুমান করা যায়।

এছনি মাসকেরেনহাস তার বই ‘লিগেসি অব ব্লাড’-এ জেনারেল জিয়ার সাথে সাক্ষাতের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। সাক্ষাতের ঘটনাটা ৭৫ এর নভেম্বরের দিকের। মাসকেরেনহাসের সাথে কথোপকথনে জিয়াউর রহমান খন্দকার মোশতাকের সাথে পাকিস্তানের দৃঢ় সম্পর্কের কথা সন্দেহভরে উল্লেখ করেন। তিনি জানান মুজিব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পরপরই পাকিস্তানে বসবাসরত কিছু মোশতাকপন্থী বাঙালি ইংল্যান্ডে যায় এবং বাংলাদেশে (তারা নাম নিয়েছিল নয় পাকিস্তান) ফিরে আসার পাঁয়তারা করেন।^{৪৩} মাসকেরেনহাসের লেখা ইংরেজি বইটির অষ্টম পরিচ্ছেদে এই তথ্যটির কথা উল্লেখ থাকলেও বাংলা অনুবাদ সংক্রন্তে গোটা অংশটিকেই কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে ইতিহাস বিকৃতির নানা তৎপরতার এটি একটি প্রমাণ।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে বার বার ইতিহাস থেকে সরিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে এবং অপরাজিতির স্বার্থে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জিয়াকেই নানাভাবে যুক্ত করার অপচেষ্টা করা হয়। অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিরা আগষ্টের হত্যাকাণ্ডকে ‘আগস্ট বিপ্লব’ বলেন এবং এই ঘটনাতে নিজেরা খুব গর্বিত তাও প্রকাশ্যে বলেছেন। অন্যদিকে মরগুম শেখ মুজিবুর রহমান ন্যূন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রক্ষী বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত তোফায়েল আহমেদ এবং সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠিয় ও ব্যর্থ।^{৪৪}

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা পরিক্ষার যে আওয়ামী লীগের মিথ্যাচার কোনোভাবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক অর্জনকে বিন্দুমাত্র

প্রশ়্নবিদ্ধ করতে পারেনি। বরং আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব হত্যাকারীদের একটি অংশকে সাথে নিয়ে গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলকে নির্মূল করার ব্যর্থ চেষ্টা করে এসেছে শুরু থেকেই। কর্নেল তাহেরের ঘনিষ্ঠিতম জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুর মন্ত্রিত্ব এবং খালেদ মোশাররফ কল্যা মাহজাবিন খালেদকে সংসদ সদস্য মনোনয়ন যার প্রমাণ। শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার আওয়ামী বয়নে লাগামহীন মিথ্যাচার আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্তুকেই প্রমাণ করে। আর ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, জিয়ার দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব, নিঃস্বার্থতাবে সর্বিধানের প্রতি আনুগত্য এবং সততাই বাংলাদেশকে কাঞ্চিত গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে এনেছিল। যা মূর্ত হয়েছিল ১৯৭৫ এর ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর: সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও বাংলাদেশের নবজন্ম

৭ নভেম্বর সাধারণ সৈনিকদের এক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনের মাধ্যমে মুক্ত হন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া। অন্যদিকে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ছিল সাধারণ সৈনিকদের মাঝে একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কোনোভাবেই এই বিপ্লব জাসদ বা তাহেরের বিপ্লব ছিল না।^{৪৫} তাহের মূলত ক্ষমতার লোভেই জিয়াউর রহমানের মুক্তিতে নিজের অংশীদারিত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান মুক্ত হওয়ার পরপরই তাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে উদ্যত হয় কর্নেল তাহের। তবে জিয়াউর রহমান তার সাথে যেতে রাজি হন নাই। এতে ক্ষুদ্র তাহের জিয়াউর রহমান সম্পর্কে নানাবিধ মিথ্যাচার শুরু করেন এবং বিপ্লবী

৪২ জার্নাল ADC Special Issue- ২০১০।

৪৩ Bangladesh A Legacy of Blood. Anthony Mascarenhas, 2013 (English edition), Page- 88, 2013.

৪৪ বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, মাহবুব তালুকদার, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৫৫-১৫৬

৪৫ তিনটি সেনা অভ্যর্থনা ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৪১

সৈনিক সংস্থার সামনে তার সাথে জিয়ার পূর্ব আলোচনার বানোয়াট তথ্য হাজির করেন। কর্নেল তাহেরের ইঙ্গিতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈন্যরা জিয়াকেও হত্যার পরিকল্পনা করে।^{৪৬} সাধারণ সৈনিক এবং জনগণের মাঝে জিয়ার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তা দখলে নিতে না পেরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তথ্য তাহের গং সাধারণ সৈনিকদের মাঝে বিভাস্তি ছড়ায়^{৪৭} আর তখনই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার উক্তানিতে তাহেরের সৈন্যরা সেনা অফিসারদের হত্যার বর্বর খেলায় মেতে ওঠে। অফিসাররা সেদিন তাহেরের সৈন্যদের দ্বারা আত্মাত্ত হয়। তাহেরের নির্দেশে অনেক অনিয়মিত সৈনিকও সেদিন সাধারণ সৈনিকের ছদ্মবেশে ক্যান্টনমেন্টে অফিসারদের রক্তের হলি খেলায় মেতে ওঠে।^{৪৮} ৭ নভেম্বর রাতে মুক্তি পাওয়ার পরপরই জেনারেল জিয়া সবরকম রক্তপাত বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন There should be no bloodshed. No retribution. Nobody will be punished without proper trial.”^{৪৯} তাঁর নির্দেশ উপক্ষা করেই তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা খালেদ মোশাররফসহ অন্যান্য অফিসারদের হত্যা করে। জাসদ ও তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মারফত সৈনিকদের জন্যে মোট বারো দফা দাবী পেশ করেন।^{৫০} ৭ নভেম্বর সকাল দশটায় সেনাপ্রধান জিয়া, জেনারেল ওসমানী, তাহেরসহ অন্যান্যরা একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে তাহের ছাড়া বাকি সবাই বারো দফাকে প্রত্যাখ্যান করে।^{৫১} বারো দফা প্রত্যাখ্যান করাটা একটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ছিল, জিয়ার একার সিদ্ধান্ত নয়। তবে এরপর দুপুর বারোটায় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কিছু সদস্য জোর করে জিয়াকে বাধ্য করে বারো দফায় সই করতে।^{৫২} এভাবেই তাহের, জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকেরা সাধারণ সৈনিকের ছদ্মবেশে বিশ্বজ্ঞলা সৃষ্টি করে পুরো ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে নেরাজ্য সৃষ্টি করে।^{৫৩} তারা শোগান তোলে “সৈনিক সৈনিক ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই”। (১২ দফা- পরিশিষ্ট- ১)।

৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমান পুনরায় সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে

৪৬ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৫৮

৪৭ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৮৪

৪৮ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাত্ত মধ্য-আগস্ট ও মড়েন্ট্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল অবঃ, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৪৬

৪৯ সৈনিক জীবন গৌরবের একাত্তর রক্তাত্ত পঁচাত্তর, হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। পৃষ্ঠা- ২৬৮

৫০ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৪৮

৫১ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১২০

৫২ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৬৫

ডেপুটি মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবেও দায়িত্ব দেয়া হয়। ইতিমধ্যেই খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল খন্দকার মোশতাকের বদলে মুজিব সরকার নিয়োজিত তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সায়েমকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেন, একই সাথে সংবিধান এবং সংসদকে স্থগিত করে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিক সামরিক জারি করে মোশাররফ-শাফায়াত। খন্দকার মোশতাকের বদলে কারাবন্দি উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুলকে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি করার কথনোই চিন্তা করেনি তারা। প্রধান বিচারপতি সায়েম হন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। বিপ্লবের পরপর কর্নেল তাহের সৈনিকদের মাঝে বিভাস্তি ছড়িয়ে দিলে শুরুতেই জেনারেল জিয়ার প্রধান কাজ হয় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। সে সময় জিয়াই ছিলেন সেনাবাহিনীর একমাত্র কমান্ড কারণ বাকি সকল চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছিল।^{৫৩} সেনাবাহিনীর সকল স্তরের কর্মকর্তার সাথে বৈঠক করেন তিনি। বিদ্রোহ দমনে ৯ নভেম্বর থেকেই হেলিকপ্টারযোগে সারাদেশের সেনানিবাসগুলোতে সফর করেন জেনারেল জিয়া।^{৫৪} ১২ তারিখ থেকেই বেশির ভাগ অফিসার ক্যান্টনমেন্টের নিজ নিজ ইউনিটে ফিরে আসতে শুরু করে। ১৪-১৫ তারিখ থেকেই ক্যান্টনমেন্ট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বিভাস্তি সৈনিকরা তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ক্যান্টনমেন্টে নতুন শোগান শুরু হয়, সিপাহী অফিসার ভাই ভাই!”^{৫৫} ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীতে যে বিশ্বজ্ঞলা দমন করা সম্ভব হয়েছিল, তা শুধু নভেম্বরের বিশ্বজ্ঞলাই নয় বরং গোটা সেনাবাহিনীতে তথা রাষ্ট্রে যে নেরাজ্য বিরাজ করছিল বলা চলে তারও সমাপ্তি হয়েছিল। সুসংগঠিত বাংলাদেশের নবজন্ম ঘটেছিল ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। রাজধানীসহ সারা দেশের আম-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে। সিপাহী বিপ্লব পরিণত হয় সিপাহী-জনতার বিপ্লবে। রাজপথে শোগান ওঠে “সিপাহী-জনতা ভাই ভাই।” জিয়াউর রহমান, সশস্ত্র বাহিনী এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনতা সংযুক্ত হয় মহামিলনের এক কেন্দ্র-বিন্দুতে।

৭ নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীতে যে বিশ্বজ্ঞলা দমন করা সম্ভব হয়েছিল,

৫৩ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৬২

৫৪ ১৯শী বাহিনীর সত্য মিথ্যা, আনোয়ার উল আলম, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৭৯

৫৫ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, কর্নেল অবঃ এম. এ. হামিদ পিএসসি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৬৮

সৈন্যদের সহায়তায় দেশে আইন-শৃঙ্খলা এবং সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।”^{৫৬} রাশিয়ান এই লেখকের বই থেকে আরও জানা যায়, “১৯৭৬ সালের মধ্যভাগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা ছিতি আসে।। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সুস্থিরতা আসে।”^{৫৭}

সেনাপ্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমানের চেইন অব কমান্ড আনয়নের প্রক্রিয়াতে প্রচণ্ড ক্ষুদ্র ছিল শেখ মুজিব হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা। তবে আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সৈনিকদের মধ্যে জিয়াউর রহমান খুব প্রিয় হওয়ায় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই তারা জিয়াউর রহমানকে আক্রমণ করে নাই। জিয়া শুরু থেকেই একজন পুরোদস্তর দেশপ্রেমিক, সংবিধান অনুসারী, পেশাদার সেনানায়ক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যাকাণ্ডের পরপরই ৪৬ ট্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল জেনারেল জিয়ার কাছে পরিস্থিতি অবহিত করে নির্দেশনা চাইলে জেনারেল জিয়া সংবিধানকেই একমাত্র দিক-নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।^{৫৮} এই পরিস্থিতিতে সেটাই ছিল সংবিধানকে সমৃদ্ধ রাখার একমাত্র পথ। সাফায়াত জামিলের লেখা একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাঙ্গ মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর বইতে তিনি নিজেও একই কথা বলেন।^{৫৯} ১৫ই আগস্টের পর থেকেই সেনাবাহিনীকে পুনরায় চেইন অব কমান্ডের আওতায় নিয়ে আসাটা মোটামুটি অসাধ্য হয়ে উঠেছিল, যই নভেম্বর বিপ্লবের পর জেনারেল জিয়া সেই অসাধ্য কাজটিই সম্পন্ন করেন। শুধু মাত্র জিয়ার দ্বিদর্শিতায় রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীকে সেদিন দ্রুত সুশৃঙ্খল করা সম্ভব হয়েছিল। আজ মুজিব হত্যার সাথে জিয়াকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন অপচেষ্টায় যারা লিপ্ত, তারা মেজর ডালিম ও ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক শাফায়াত জামিলের বই ছাড়াও অন্যান্য সুত্র থেকে ইতিহাসের প্রকৃত সত্য জেনে নিতে পারেন।

ইতিহাসের ডাকে জেনারেল জিয়ার সাড়া ও বাংলাদেশে গণতন্ত্রে

^{৫৬} বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা: ১৯৭১-১৯৮৫, ভাদ্যমির পুচকভ, দৃ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ১০০

^{৫৭} বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা: ১৯৭১-১৯৮৫, ভাদ্যমির পুচকভ, দৃ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ১০৭

^{৫৮} Bangladesh A Legacy of blood, Anthony Mascarenhas, 2013, Page: 76

^{৫৯} একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাঙ্গ মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল (অবং), পৃষ্ঠা- ১০৩।

পুনরুদ্ধার

যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, আস্থা রেখেছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর সেই স্বপ্ন ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে আসছিল। ১৯৭২ সালের পর থেকেই দেশে আওয়ামী দুঃশাসন, দুর্নীতি, আন্তঃকোন্দল, দুর্ভিক্ষ, সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক দুরবস্থার যাঁতাকলে দেশের মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে। সারা দেশে তৈরি হয় এক অরাজক পরিস্থিতি। গুম, খুন, দুর্নীতি, হানাহানি, ধর্ষণ, দুর্ভিক্ষে গোটা জাতি হয়ে পড়েছিল দিশেহারা। সে সময়কার দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যবন্টন অব্যবস্থাপনার বর্ণনা পাওয়া যায় মওদুদ আহমদের লেখায়- “১৯৭৩-৭৪ সালে মূল লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ২০ লাখ টন ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ১৮ লাখ টনের স্থলে খাদ্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১৮ লাখ ৩০ হাজার টন। লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করায় সে বছর খাদ্য আমদানির পরিমাণও বাড়িয়ে ২২ লাখ টনে স্থির করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্যেৎপাদনের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৩২ লাখ ২০ হাজার টন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত হয় ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩০ হাজার টন। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্যের মাথাপিছু, বার্ষিক প্রাপ্যতা ছিল ৩৩৯ পাউড বা স্মরণকালের মধ্যে নিম্নতম।”^{৬০}

জাসদের গণবাহিনী, সর্বহারা পার্টি এবং গোপন বামপন্থী দলসমূহের রাজনৈতিক বিরোধিতার পাশাপাশি সাধারণ জনগণও ছিল বিক্ষুল। এই পরিস্থিতিতে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী ডাক দিয়েছিলেন ভুখা মিছিলের। বসেছিলেন অনশনে, ডাক দিলেন হরতালের।^{৬১} বাংলাদেশের রাজনীতিতে শুরু হয়েছিল গভীর সংকট। আওয়ামী অপশাসনে দেশের মানুষের জীবন যখন বিপন্ন, সামাজিক অস্থিরতা যখন চরমে তখন আওয়ামী লীগেরই একাংশ শেখ মুজিব হত্যার ফন্দি আঁটতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরপর মোশতাক-ফারহক-মোশাররফ-তাহের গংদের ক্ষমতার ষড়যন্ত্রে গোটা রাষ্ট্রই যেন এক অন্ধকৃপে পতিত হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ও সংবিধান সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় নিয়ে জনগণের

^{৬০} বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ (অনুবাদক: জগলুল আলম), ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৭২

^{৬১} বাংলাদেশ: বাহাতুর থেকে পঁচাতুর, মেজর নাসির উদ্দিন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৮০

ইচ্ছাতেই জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নামে নতুন একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গঠন করেন। পরবর্তীতে যা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'তে পরিণত হয়। ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় জিয়াউর রহমান দেশপ্রেমে বলীয়ান হয়ে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ার পরেও স্বৈরশাসনের পথে না হেঁটে নিজ দল ও গোটা দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনেন। ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী চেতনা এবং একাত্তরের স্বাধীনতার মূল চেতনা এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে যে, ব্যক্তিক্রম বাদে বাংলাদেশের স্বার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সর্বদা সহায়ক। সেদিন জেনারেল জিয়া যদি চাইতেন, তবে সাধারণ জনতা-সৈনিকদের উচ্চস্থিত সমর্থনের উপর ভর করেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারতেন। ক্ষমতা দখলের যথেষ্ট সুযোগ তাঁর ছিল ৩২ কিন্তু তিনি তা করেননি। কেবলমাত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই সেদিন তিনি লড়েছিলেন, আর তাই একজন যোগ্য সেনানায়ক হিসেবেই জেনারেল জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র ফেরানোর যুদ্ধে একজন বিজয়ী যোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শকে ধারণ করেন এমন সকল পর্যায়ের শুভানুধ্যায়ী, নেতা, কর্মী, সমর্থকদের প্রতি ৭ নভেম্বরের আহ্বান, ইতিহাস বিকৃতির সকল অপতৎপরতা রূপে দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে ইতিহাস চর্চার মূল ধারায়। ইতিহাস, ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র উদ্বারের লড়াই যেহেতু পরিপূরক, তাই ৭ নভেম্বরের প্রকৃত চেতনা লাগাতারভাবে জনতার মাঝে তুলে ধরুন। ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র উদ্বারের চলমান লড়াইয়ে ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবী চেতনা আমাদেরকে আজও করে তুলছে বলীয়ান।

জাসদ প্রদত্ত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা

১. আমাদের বিপ্লব নেতা বদলানোর জন্য নয়। এই বিপ্লব গরিব স্বার্থের জন্য। এত দিন আমরা ছিলাম ধনীদের বাহিনী। ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে। ১৫ আগস্ট তার প্রামাণ। তাই এবার আমরা ধনীদের দ্বারা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুত্থান করিনি। আমরা বিপ্লব করেছি। আমরা জনতার সঙ্গে এক হয়ে বিপ্লবে নেমেছি। আমরা জনতার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ থেকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী হবে গরিবশ্রেণির স্বার্থরক্ষার একটি গণবাহিনী।
২. অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।
৩. রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।
৪. অফিসার ও জওয়ানদের ভেদাভেদ দূর করতে হবে, অফিসারদের আলাদাভাবে নিযুক্ত না করে সামরিক শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে।
৫. অফিসারদের ও জওয়ানদের একই রেশন ও একই রাকম থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. অফিসারদের জন্য আর্মির কোনো জওয়ানকে ব্যাটম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা চলবে না।
৭. মুক্তিযুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থান ও আজকের বিপ্লবে যেসব দেশপ্রেমিক ভাই শহীদ হয়েছেন, তাদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৮. ব্রিটিশ আমলের আইনকানুন বদলাতে হবে।
৯. সব দুর্নীতিবাজের সম্পত্তি বাজেয়ান্ত করতে হবে। বিদেশে যারা টাকা জমিয়েছে, তাদের টাকা বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে।
১০. যেসব সামরিক অফিসার ও জওয়ানকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. জওয়ানদের বেতন সম্মত হোড হতে হবে এবং ফ্যামিলি অ্যাকোমোডেশন ফ্রি হতে হবে।
১২. পাকিস্তান-ফেরত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ১৮ মাসের বেতন দিতে হবে।
নিবেদক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ

নভেম্বর ১৯৭৫

[সুত্রঃ সৈনিক জীবন: গৌরবের একান্তর, রক্ষাক্ষ পঁচান্তর, হাফিজ উদ্দিন আহমদ
বীর বিক্রম, ২০২০]
(এখানে প্রতিফলিত মতামত একান্তই লেখকের নিজস্ব)

পরিশিষ্ট- ২

দিনপঞ্জি- ১৯৭৫

(জানুয়ারি- নভেম্বর)

- ০২ জানুয়ারি : পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির প্রধান সিরাজ সিকদার আটকাবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত।
- ২১ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান।
- ২৫ জানুয়ারি : দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত।
: শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হলেন।
- ২৭ জানুয়ারি : পুলিশ কর্তৃক দৈনিক গণকঠ কার্যালয় দখল।
- ১১ ফেব্রুয়ারি : জেনারেল ওসমানী ও মঙ্গলুল হোসেনের সংসদ সদস্য পদ ত্যাগ।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাকশাল নামে নতুন জাতীয় দল-এর ঘোষণা। দেশের অন্যসব রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বাকশালের প্রধান হন।
- ৮ মার্চ : টাঙ্গাইলে এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা ভাসানীর ভাষণ দান।
- ৯ মার্চ : গণকঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।
- ২৮ এপ্রিল : সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ সরকার এবং মইনুদ্দিন আহমেদ মানিক বাকশালে যোগদান না করায় সংসদে তদের আসন শূন্য ঘোষণা।
- ২৩ মে : একক জাতীয় দল বাকশালে যোগদানের জন্য ২২৪ জন সাংবাদিকের প্রথম ব্যাচের আবেদন। ৪ জুন ৩০২ জনের আরেকটি ব্যাচ একইভাবে

বাকশালে যোগদানের সুযোগ চেয়ে আবেদন জানায়।

- ৬ জুন : বাকশালের অঙ্গসংগঠন ও নেতৃত্বদের নাম ঘোষণা। মুজিব বাহিনীর দুই নেতা আবদুর রাজ্জাক ও শেখ ফজলুল হক মণি এই দলের সম্পাদক নির্বাচিত।
- ৯ জুন : দেশের দৈনিকগুলোর নয়জন সম্পাদকের বাকশালে যোগদানের আবেদন।
- ১৬ জুন : সংবাদপত্র অর্ডিন্যাস ১৯৭৫ ঘোষিত। কেবল চারটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অন্যসব সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা। এই ঘোষণায় তৎক্ষণিকভাবে ২৯টি দৈনিক ও ১৩৮টি সাপ্তাহিকের প্রকাশনা বন্ধ।
- ২৭ জুলাই : দেশের এক লাখ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন।
- ০৮ আগস্ট : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী বাকশাল শাসনে মর্ত্তী হিসেবে নিযুক্ত।
- ১১ আগস্ট : বাকশাল ব্যবস্থার মুখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে বঙ্গভবনে জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন।
- ১২ আগস্ট : রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এন এম নূরজামানের যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ।
- ১৪ আগস্ট : রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনা দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি।
- ১৫ আগস্ট : সামরিক বাহিনির সদস্যদের হামলায় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসগ্রহে পরিবারের ২১ জন সদস্যসহ নিহত। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ। দেশে সামরিক আইন জারি। পূর্ববর্তী মন্ত্রিপরিষদের ১৬ মর্ত্তী বহাল।
- ২৪ আগস্ট : জেনারেল ওসমানী রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত।
: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান হিসেবে নিয়োগ।
- ৩১ আগস্ট : বাংলাদেশকে চীনের স্বীকৃতি দান।
- ০১ সেপ্টেম্বর : প্রেসিডেন্ট আদেশ বলে বাকশাল ব্যবস্থা রাহিত।
- ০৩ অক্টোবর : রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা।

- ০৪ অক্টোবর : রক্ষীবাহিনী বিলুপ্তি করে এর সদস্যদের সামরিক বাহিনীতে আন্তিকরণের ঘোষণা।
- ০৩ নভেম্বর : সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্তৃক সামরিক অভ্যর্থন। তাজউদ্দীন আহমদ ও অপর তিন জ্যেষ্ঠ আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় নিহত। সর্বশেষ সামরিক অভ্যর্থনকে স্বাগত জানিয়ে আওয়ামী লীগ-সিপিবি-ন্যাপ এর কর্মী-সমর্থকদের মিছিল।
- ০৪ নভেম্বর : অভ্যর্থনকারীদের চাপে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ।
: কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কর্মীদের দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে লিফলেট বিতরণ। লিফলেটে সেনিকদের বিদ্রোহ করা এবং ভারতের দলাল ও বিশ্বসংঘাতক খালেদ চঙ্গকে উৎখাত করার আহ্বান।
- ৫ নভেম্বর : বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ।
- ৬ নভেম্বর : জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা।
: ঢাকা প্রকৌশলী আনোয়ার সিদ্দিকীর বাসভবনে জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বন্দের বৈঠক। আখলাকুর রহমানসহ অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও দেশে সামরিক অভ্যর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- ৭ নভেম্বর : সেনানিবাসগুলোতে কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকদের অভ্যর্থন; বন্দি জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার।
: কারাগার থেকে বিপ্লবী সৈনিকরা জাসদ নেতা এম এ আউয়াল, মোহাম্মদ শাজাহান ও মির্জা সুলতান রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে।
: বিহোডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও তার দুই সামরিক সহযোগী অঙ্গতনামা বিদ্রোহী সৈনিকদের গুলিতে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে নিহত।
: রাষ্ট্রপতি সায়েম কর্তৃক সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ।
বিগেডিয়ার নূরওজ্জামানের ভারতে পলায়ন।
- ০৮ নভেম্বর : শহীদ মিনারে জাসদের সমাবেশ সৈনিকদের আক্রমণে ছ্রেণ্ডে।

- আ ফ ম মাহবুল হক আহত।
: মুজিব শাসনামলে কারাগারে আটক আ স ম আব্দুর রব ও মেজর এম এ জলিলসহ জাসদ নেতৃত্বন্দের মুক্তি।
- ১৫ নভেম্বর: জিয়াউর রহমানের সঙ্গে জাসদ নেতৃত্বন্দের রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে জাসদ কর্তৃক সেনানিবাসে আবারও প্রচারপত্র বিলি। সেনাবাহিনীর জওয়ান, কৃষক, শ্রমিক সবাইকে নিয়ে দেশে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের দাবি।
: জিয়াউর রহমান কর্তৃক সেনাবাহিনীর কিছু ইউনিটকে ঢাকা থেকে দেশের অন্যত্র স্থানান্তর।
- ২০ নভেম্বর : মেজর জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে সামরিক বাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে নিয়োগ।
- ২৩-২৪ নভেম্বর: রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে মেজর এম এ জলিল, আ স ম আব্দুর রব, কর্নেল আবু তাহেরসহ বহু নেতা-কর্মী আটক।
- ২৬ নভেম্বর : জাসদের ঢাকা মহানগর গণবাহিনীর ছয়জন সদস্য কর্তৃক ধানমন্ডিতে ভারতীয় দুর্তাবাস থেকে হাইকমিশনার সমর সেনকে অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা। অপারেশনে ঢাকা গণবাহিনী সদস্য নিহিত।

(সংকলন সূত্র: মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ, আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য ২০১৫)

(এখানে প্রতিফলিত মতামত একান্তই লেখকের নিজস্ব)



১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সেনাপ্রধানকে মুক্ত
করে বিজয়ী বিপুলী সিপাহীরা সেনানায়ক জিয়ার সাথে



জনতার সাথে রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি